আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সারকথা এবং বাংলাভাষায় চর্চা

জগৎপতি সরকার

কথিত আছে জ্ঞান ব্রহ্মা হতে উৎপন্ন হয়ে অধ্যাত্ম যোগে জগৎ-কল্যাণে ব্রহ্মা অথর্ববেদের সর্বস্ব নিয়ে আয়ুরক্ষাশাস্ত্র প্রচারে ইচ্ছা প্রকাশ করে নিজের নামে প্রায় এক লক্ষ শ্লোক নির্মাণ করে ব্রহ্মসংহিত নামে একটি আয়ুর্বেদ গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর তিনি তাঁর সকল কর্মাধ্যক্ষ এবং অপ্রতিম বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন দক্ষ প্রজাপতিকে সমুদয় আয়ুর্বেদ উপদেশ প্রদান করেন। এরপর দক্ষ প্রজাপতি সুপণ্ডিত অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে সমগ্র আয়ুর্বেদ অধ্যয়ন করান এবং ক্রমান্বয়ে অশ্বিনীকুমারদ্বয় স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রকে সমগ্র আয়ুর্বেদশাস্ত্রে শিক্ষা প্রদান করেন। এইভাবে পরিপূর্ণ শিক্ষার পর তাঁরা পরপর সকলেই এক একটি আয়ুর্বেদ সংহিতা রচনা করেন। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে দেবতাগণের রোগশান্তি বা রোগ নিরাময়ের জন্য নির্মিত চিকিৎসাশাস্ত্রের নাম ছিল আয়ুর্বেদ। এই শাস্ত্রটিকে বেদস্বরূপ স্বীকার করা হয়েছিল বলেই তার নাম হয়েছিল আয়ুর্বেদ। এখন প্রশ্ন পরবর্তীকালে মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনেও কিন্তু আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা দেখা দিল। বৈদিক যুগে চরকীয় ধারা নামে একটি বৈদ্য বিদ্যা প্রচলিত ছিল। কালের গ্রাসে তা ক্রমশ বিনষ্ট হয়ে যায়। আত্রেয় এবং পুনর্বসু তাকে উদ্ধার করেন। অবশ্য এর মধ্যে পরে অনেক তথ্য সংযোজিত হয়েছিল। আর সেটির উপদেশ পান অগ্নিবেশ। পুনর্বসুর আমলে বৈদ্যকল্পটাই একটি পরিপূর্ণ চরকীয় রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এই চরকীয় ধারাটি ছিল কৃষ্ণযজুর্বেদীয় ধারা। তখন ভ্রমণশীল আচার্যসকল তাঁদের উপলব্ধ ভেষজ জ্ঞান মানবকল্যাণে শিষ্য পরম্পরায় রক্ষা করতেন। আর শিষ্যরাও চরণ করতেন অর্থাৎ ইতস্তত ভ্রমণ করতেন আচার্যের সঙ্গে। তার থেকেই এই বিদ্যাটির নাম হয় চরক। চরক কোনো ব্যক্তির নাম নয়। এটি ভুল ধারণা। আর অগ্নিবেশের রচিত সংহিতায় চরকের ধারা সংযোজিত হয়েছিল। আজও চরক সংহিতা বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে উক্ত ধারায় প্রাপ্ত গ্রন্থটি। প্রাচীনকাল থেকেই আয়ুর্বেদে কায় চিকিৎসা এবং শস্ত্র চিকিৎসা এইরূপ দুটি বিভাগ বর্তমান আছে। প্রথমটি চরকের ধারা (medical) এবং দ্বিতীয়টি সুশ্রুতের ধারা (surgical)। এ বিষয়ে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার যে তৎকালীন তক্ষশিলা বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়ুর্বেদ বিজ্ঞানের সর্বাধ্যক্ষ ছিলেন ঋষি আত্রেয়। তাঁর পিতা ছিলেন ভরদ্বাজ আর পুত্র ছিলেন অগ্নিবেশ। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীলটক্ক মিশ্রের পুত্র

শ্রীভব মিশ্রের 'ভাবপ্রকাশ' গ্রন্থ রচনার ফলে আয়ুর্বেদ অনেক সহজসাধ্য হয়েছিল। এবার আসা যাক সুশ্রুতের কথায়। বৈদিক যুগের বিভিন্ন শল্য চিকিৎসার ধারাগুলি একত্রিত করে তার সঙ্গে প্রয়োজন বোধে নতুন নতুন শল্য যন্ত্রের আবিষ্কারে শল্য চিকিৎসার আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন শল্য চিকিৎসার শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী সুশ্রুত। উনি ছিলেন ধন্বন্তরির শিষ্য। তিনি তাঁর বিভিন্ন শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে ১১২০ রকম রোগের চিকিৎসা নিজেই করতেন। ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত সংকটজনক রোগের নিরাময় কল্পেও তিনি তাঁর বিবিধ শল্যযন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। এরকমের ১২৭টি শল্যযন্ত্র নির্মাণের পর তিনি যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম ছিল সুশ্রুত সংহিতা। এটি একটি অমূল্য গ্রন্থ। উক্ত দুটি গ্রন্থ রচিত হবার পর কায় চিকিৎসা এবং শল্য চিকিৎসার সাধনা করলেন দৃঢ়বল, ভল্বনাচার্য, নাগার্জুন, বাগভট, মাধবকর, বৃন্দ, চক্রপাণি, চক্রদত্ত, শাঙ্গধর, জীবক, ভাবমিত্র, বঙ্গসেন প্রভৃতি মনীষীগণ। এছাড়াও তাঁদের সমসাময়িক বহু মনীষীর প্রগাঢ় জ্ঞান ও মনীষার উপর প্রতিষ্ঠিত আজকের এই আয়ুর্বেদ বিজ্ঞান। অবশ্য একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে আদিম মানুষের রোগযন্ত্রণা নিরাময়ে গাছ-গাছড়া, বহু জান্তব পদার্থ, ধাতুপদার্থ, মাটি, প্রস্তর খণ্ডের ব্যবহার, মন্ত্র তন্ত্র, জলপড়া, মাদুলি, কবচ প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রে সংযোজিত হয়েছিল।

প্রকৃত চিকিৎসাবিদ্যায় ধর্মশাস্ত্রকারদের বিধানবিরুদ্ধ নানান নির্দেশ থাকায় ধর্মশাস্ত্রকারেরা চিকিৎসক ও চিকিৎসাবিদ্যার তীব্র নিন্দা করে গেছেন। ঋগ্বেদের প্রাচীনতর অংশে অবশ্য বর্ণাশ্রম সমাজের কোনো নজির মেলে না। চিকিৎসা ও শল্যবিদ্যার বিরুদ্ধেও কোনো মন্তব্য চোখে পড়ে না। তবে যজুর্বেদের যুগে এসে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা একটা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তাই সে যুগে চিকিৎসাবিদ্যার প্রতি ঘৃণার দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। অশ্বিনীদ্বয় দেবতা হলেও চিকিৎসা প্রসঙ্গে ইতরজনের সঙ্গে অত্যধিক মেলামেশা অপবিত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে। কারণ প্রসিদ্ধ দেবতাদেরও তখন জাত যাবার ভয় ছিল। তাই ভারতীয় ইতিহাসে সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রকৃতি বিজ্ঞানের দিকে প্রথম দুঃসাহসী পদক্ষেপ নিয়েছিল আয়ুর্বেদশাস্ত্র। কিন্তু সে যুগে সামাজিক পরিস্থিতির বিরুদ্ধতা এমনই প্রবল ছিল যে তা বহুলাংশে প্রতিশ্রুতিমাত্রই রয়ে গেল। অথর্ববেদের যুগে এসে সেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রথম যুক্তি ব্যপাশ্রয় ভেষজ এর দিকে অগ্রসর হবার প্রয়োজন দেখা দিল। তার লক্ষণ হিসেবে বলা হয়েছে 'আহার ঔষধ - দ্রব্যানাং - যোজনা' অর্থাৎ আহার ও ঔষধ হিসেবে দ্রব্যের ব্যবহার। অথর্ববেদে 'ওষধি' বলে নানারকম শিকড় বাকড়ের উল্লেখ থাকলেও তা ছিল নেহাতই তাগা-তাবিজ ধারণ করার নির্দেশ মাত্র। পক্ষান্তরে চরক সংহিতায় আহার ও ঔষধ হিসেবে সেবনাদির যে নির্দেশ পাওয়া যায় তার তালিকায় স্থান পায় ১৬৫ রকম জীবজন্তুর মাংস, মেদ, অস্থি,

দুধ, মূত্র প্রভৃতি। এছাড়াও ৯১০ রকম গাছ-গাছড়ার ছাল-ফল-মূল প্রভৃতিরও উল্লেখ বর্তমান। এই বিশাল তালিকায় ক্ষয়রোগ প্রভৃতির নিরাময়ের জন্য গোমাংস জাতীয় শাস্ত্র-নিষিদ্ধ খাদ্যের উপরও বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রের এই বৈপ্লবিক উত্থানের দীর্ঘ ও বিশদ আলোচনা করে গেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর History of Science and Technology in Ancient India গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে। আমাদের বৈদিক সাংস্কৃতিক যুগে আয়ুর্বেদশাস্ত্রের মধ্যে এই ভাঙ্গাগড়া, নতুন মতের প্রতিষ্ঠা, কতরকম নতুন প্রণালী ও পথের প্রচার, কত নতুন সাধনার আবিষ্কার হয়েছে তার আজ অনেকখানিই বিনষ্ট, অবহেলিত এবং কিছু তত্ত্ব অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। অনেক পণ্ডিতেরা আয়ুর্বেদকে ঋগ্‌বেদের উপবেদ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ধন্বন্তরী সুশ্রুতকে আয়ুর্বেদ শিক্ষা দেবার কালে জানান যে ব্রহ্মা লোকসৃষ্টির প্রাক্কালে লোকরক্ষার্থে অথর্ববেদের অঙ্গ হিসেবে আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। উক্ত অঙ্গে এক হাজার শ্লোক ছিল এবং প্রতি অধ্যায়ে একশত শ্লোক ছিল। কিন্তু মানুষের স্বল্পায়ু হবার দরুন তাদের মেধায় বোধগম্য এবং স্বল্প সময়ে তা শিক্ষালাভের সুযোগে তিনি সেগুলিকে আটভাগে ভাগ করেন। সেই ভাগগুলি হচ্ছে যথাক্রমে শল্য, শলাকা, কায়, কৌমারভৃত্য, অগদ, ভূতবিদ্যা, রসায়ণ, বাজীকরণতন্ত্র প্রভৃতি। সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে মানুষ সৃষ্টির পূর্বেই ব্রহ্মা আয়ুর্বেদ সৃষ্টি করেন। সূত্রস্থানের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকে বলা হয়েছে – "ইয়ংখলু আয়ুর্বেদা নাম যদুপাঙ্গমথর্বেদ স্যানুভূতাদ্যৈব প্রজাঃ শ্লোকশতসহস্রমধ্যায় সহস্রংচ কৃতবান স্বয়ম্ভু"। তাই প্রিয় সৃষ্টিকে নীরোগ দীর্ঘায়ু রাখার জন্য ঈশ্বর আদি দেবতা ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন রোগ নিরাময়ী আয়ুর্বেদ শাস্ত্র প্রণয়ন করতে। সে যুগে অথর্ববেদকে অথর্বনদের বেদগ্রন্থ বলে স্বীকার করার দরুন তার নাম হয় অথর্ববেদ। অথর্বন শব্দের' অর্থ ছিল অগ্নি উপাসক। অনেক সময় অথর্ববেদকে অথর্বাঙ্গিরস বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অথর্বনরা অনেক সময়ই নানান যাদুমন্ত্র, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। সেগুলি সবসময় মানুষের ভাল কাজে ব্যবহৃত হতো তা নয়, মন্দ কাজেও সেগুলি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। সেখানে নিঃসন্দেহে তা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাতেও ব্যবহার করা হয়েছে। আর সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে অথর্ববেদের বিষয়বস্তুকে চারটি মূলভাগে ভাগ করা যায়। সেগুলি যথাক্রমে (১) ভৈষজ্য (২) আয়ুস্য (৩) পৌষ্টক এবং (৪) অভিচারিকা। উক্ত চারটি ভাগই আলাদা আলাদাভাবে আলোচিত হয়েছে নানা আঙ্গিকে। কিন্তু এগুলি প্রায় সবই ছিল মন্ত্র, গান প্রভৃতি। সেগুলি নানান সুরে গাওয়া হতো চিকিৎসার প্রেক্ষিতে। কিন্তু তার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ প্রসঙ্গে একটা কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে অথর্ববেদের ভাষা ছিল ঋগ্‌বেদের ভাষা অপেক্ষা অর্বাচীন এবং অনেক সময়ই তা লৌকিক ভাষা নিয়েই গঠিত হয়েছিল।

এটাও তার অন্যান্য বেদের সঙ্গে এক আসনে বসার অধিকার-বঞ্চিত হবার কারণ। কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হয় যে অথর্ববেদে আলোচিত পরিবার কথা, সমাজ এবং সংস্কৃতি ছিল একেবারে সাধারণ মানুষের সঙ্গে, জীবন-জীবিকার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এবং অনেকখানি জায়গা ছিল চিন্তার প্রসারতা এবং উদারতার প্রমাণ। তাই তার গ্রহণযোগ্যতাও ছিল অন্যান্য বেদের তুলনায় অনেক বেশি। সেখানে মানুষ এবং প্রকৃতির সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। অথর্ববেদের সঙ্গে আয়ুর্বেদের সম্পৃক্ততা এখানেই। অথর্ববেদ সংহিতার গুরুত্ব আরও খানিকটা বেড়ে যায় যখন আমরা দেখি সেখানে সমাজতত্ত্ব এবং ধর্মীয় ইতিহাস একসঙ্গে আলোচিত হয়েছে। নিশ্চয়ই দর্শনের গুরুত্ব ছিল সেখানে। মোটের উপর অথর্ববেদের মৌল দার্শনিক ধারার পর্যালোচনা প্রাচীন ভারতের দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে বহুবিধ প্রবণতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের এক জটিল বিকাশ অপেক্ষাকৃত কার্যকারণ সূত্রে ব্যাখ্যা করার ব্যাপারে আজও সাহায্য করে। সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয় দর্শনশাস্ত্র এবং কোনো কোনো বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ করে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের সাফল্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধটুকুও। সময়োপযোগী চিন্তাভাবনা অথর্ববেদকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল একথা স্বীকার করতেই হয়। আবার অনেক পণ্ডিতেরা অথর্বন শব্দের সমার্থক শব্দ হিসেবে জ্ঞানী শব্দটিকেও বেছে নেন। সুতরাং নানান জ্ঞান সম্বলিত চিন্তাভাবনা যে তার মধ্যে নিহিত হবে এটা ধরে নেওয়া যায়। একজন বিখ্যাত বেদ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত কুনহন রাজার বক্তব্য তুলে ধরতে পারি এ প্রসঙ্গে। তিনি একবার বলেছিলেন – "There might have been some fear of the objects of Nature in the minds of the common people in ancient India, as in the case of other nations, but there was also the advanced section of the people who saw the Nature only certain powers that shone like illuminations to their vision. Similarly there might have been people who professed to cure diseases and bring about happiness through the recitation of some spells, in the same age, but there were the advanced people who saw fit themes for high class poetry in such practices and sang about them. This latter is found in the Atharvaveda".

এককথায় বলতে গেলে অথর্ববেদের ইতস্তত ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিক্ষিপ্ত চিকিৎসা প্রণালীর একসঙ্গে সংগৃহীত শাস্ত্রের নামই আয়ুর্বেদশাস্ত্র। বাহ্য প্রকৃতি শক্তির নিয়মশৃঙ্খলা, পদার্থচয়ের গুণাগুণ, বিবিধ জীবের বিবিধ প্রকৃতি, দেহপ্রকৃতি, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয় এবং ব্যাধিমুক্তির চরম এবং পরমকল্যাণকর ব্যবস্থার নামই আয়ুর্বেদ।

যাই হোক, প্রাচীন ভারতবর্ষে এমন অনেক ভ্রমণশীল সাধু সন্ন্যাসী ছিলেন যাঁরা গাছ গাছড়ার ঔষধির দ্বারা মানুষের স্বাস্থ্য চিকিৎসা করতে পারতেন। এঁদেরকে

সাধারণত চরক সন্ন্যাসী, চরক সাধু বা চরক বৈদ্য বলে ডাকা হতো। একথা ঠিক মানুষ মাত্রেরই এমন কোন রোগ নেই যার নিরাময় বা প্রতিকারের ঔষধ নেই। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের মধ্যে এই তত্ত্বের উপলব্ধি এবং স্বীকৃতি নিহিত আছে। প্রাচ্য মনীষীরা বলেন যে মানুষ যে দেশে জন্মগ্রহণ করেন তাঁর পক্ষে সেই দেশের ঔষধ, খাদ্য, প্রাকৃতিক আবহাওয়া, পরিবেশ, প্রকৃতি স্বাস্থ্যের পক্ষে একান্ত উপযোগী হয়। আর তার জন্য আজও কোনো মানুষের অসুখের উৎপীড়ন হলে মানুষ তখন তার নিজের দেশেই ফেরে। এই নাড়ির টান মানুষকে সুস্থও করে দেয় অনেক সময়। এবং এই নিরাময়ের মূল উপকরণও কিন্তু স্থানীয় গাছ-গাছড়া, ফলমূল বা সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বর্ণিত চিকিৎসা প্রণালীও কিন্তু উক্ত সব কিছুরই সমন্বয় বলা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের নিয়মানুযায়ী রোগ প্রতিকারের ক্ষেত্রে রসতন্ত্রের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। প্রাক্ আর্যগণের মধ্যে অনেকেই এই রসতন্ত্র বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং সেকালে রসতন্ত্রের উৎকর্ষ সাধনের সঙ্গে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে আমরা প্রথম রসগ্রন্থ প্রণেতা হিসেবে যাঁদের নাম পাই তাঁরা হলেন আদিম, চন্দ্রসেন, সুসেন রাবণ, রামচন্দ্র প্রমুখ। নৃপতি রামচন্দ্র প্রণীত রসায়ণ শাস্ত্রের প্রথম গ্রন্থ হল 'রামরাজীয়' আর দ্বিতীয় গ্রন্থ হল 'রসেন্দ্র চিন্তামণি'। এছাড়াও রসগ্রন্থ সমূহ হচ্ছে রসেন্দ্রসার, রসহৃদয়তন্ত্র, রসরত্নসমুচয়, রসার্ণব প্রভৃতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য মহাদার্শনিক মাধবাচার্য তাঁর সর্বদর্শনসংগ্রহে রসদর্শন আলোচনায় 'রসার্ণব' তন্ত্র গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেছেন। প্রখ্যাত রসায়ণবিদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পরবর্তীকালে রসার্ণব গ্রন্থের সম্পাদনা করেন। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শুরু থেকেই আরবদের সঙ্গে ভারতের একটা বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। আরবীয়গণ দক্ষিণ ভারত থেকে নানান প্রকারের ভেষজ, গন্ধদ্রব্য, মসলা প্রভৃতি আফ্রিকা এবং ইউরোপ মহাদেশে রপ্তানী করতেন। এইভাবে ভারতীয় ভেষজের গুণাবলী আরবীয়গণের জানার সুযোগ ঘটে। শ্রীহর্ষের সময় খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীতে সিন্ধুপ্রদেশ বাগদাদের বাদশা খলিফা মনসুরের অধীনস্থ ছিল। সেসময় ভারত থেকে বহু বিদগ্ধ পণ্ডিত তাঁর দরবারে আমন্ত্রিত হতেন। আব্বাসবংশীয় হারন-উল-রসিদ এবং মনসুর বাদশাহগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ব্রহ্মগুপ্তের 'ব্রহ্মসিদ্ধান্ত', চরকসংহিতা, সুশ্রুতসংহিতা, পঞ্চতন্ত্র, প্রভৃতি নানান সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বিখ্যাত জার্মান পণ্ডিত Maxmuller বলেছেন চরকসংহিতা এবং সুশ্রুতসংহিতা ছাড়াও মাধবকরের নিদান এবং বাগভটের অষ্টাঙ্গহৃদয় এবং আরো কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় সম্পাদিত হয়। খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর শেষভাগে আরবের বিখ্যাত গবেষক এবং চিকিৎসক R. Razi সংস্কৃত ভাষার আয়ুর্বেদীয় বহু গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। আরবীয়দের এই সমস্ত গ্রন্থ পরবর্তীকালে ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয় এবং ক্রমশ সেগুলি ইউরোপের সর্বত্র চিকিৎসা বিজ্ঞানের জগতে প্রবেশ করে।

আজও আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান অনেক ক্ষেত্রেই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের ব্যবহৃত রোগ নিরাময়ের নানান উপকরণের উপর নির্ভরশীল। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে মোট প্রায় ছয় লক্ষ গাছ গাছড়ার সন্ধান পাওয়া গেছে। কিন্তু তার মধ্যে আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে মোট প্রায় আট হাজার গাছের ঔষধি গুণাগুণ এবং বিভিন্ন অসুখে তাদের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত অনেক সংশ্লেষিত ঔষধ প্রায় ম্যাজিকের মতন কাজ করে। তবুও মানুষ আজও এইসব সংশ্লেষিত ঔষধ ব্যবহারের তুলনায় উদ্ভিজ্জ ঔষধের দিকে আবার আকৃষ্ট হচ্ছে। কারণ আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা আজও অমলিন। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট একবার বলেছিলেন —I do not want two diseases, one doctor made, one nature made. অর্থাৎ আমাদের সমাজে দুটি অসুখই চোখে পড়ে। একটি প্রকৃতি সৃষ্ট। এবং অপরটি মনুষ্য সৃষ্ট। প্রকৃতি সৃষ্ট রোগ যেটি স্বাভাবিকভাবেই মানুষের শরীরে প্রকৃতিগতভাবে তৈরি হয়। আর একটি রোগ সারাতে গিয়ে ওষুধ বিষুধ প্রয়োগে যখন নতুন নতুন রোগের জন্ম হয় সেটিকে বলে মনুষ্য সৃষ্ট রোগ। প্রকৃতিজাত রোগকে প্রকৃতিগতভাবে সারিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু মনুষ্য সৃষ্ট রোগকে সারানো কঠিন হয়ে পড়ে নানান সময়। দর্শন শাস্ত্রের জ্ঞান আয়ুর্বেদের প্রাচীন চিকিৎসকদের যে এক অভ্রান্ত পথ দেখিয়েছিল মানুষের রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে সেটা প্রমাণ করতে গিয়ে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল একসময় দুটি পরিভাষা ব্যবহার করেছিলেন। তার একটি হচ্ছে Logic এবং অপরটি হচ্ছে Applied Logic। এর বাংলা করা যেতে পারে ন্যায় এবং প্রায়োগিক ন্যায়। ন্যায় অর্থে তিনি বুঝিয়েছিলেন বিজ্ঞানের এক নিয়মতন্ত্র যা বিশ্বজনীন। যে কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সেটাকে ব্যবহার করা যায়। অন্যদিকে প্রায়োগিক ন্যায় বলতে তিনি বুঝিয়েছেন বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট একটা অংশ তাদের প্রয়োজন মেটাতে যে নিয়মগুলো ব্যবহার করেন সেটা। তবে এসবগুলোই দার্শনিকদের চিন্তা চেতনা থেকেই রূপ পেয়েছিল। বিজ্ঞানীদের শ্রম এবং প্রয়োগ সেখানে বিশেষ কোনো ভূমিকা নেয়নি। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে উক্ত দুটি বিষয়ই চিকিৎসকের রোগ নির্ণয় এবং তার প্রতিকারের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ প্রত্যয় দান করেছিল। এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে প্রত্যয় অর্থে 'কারণ' শব্দকে বোঝানো হয়েছে। তবে কারণ অর্থে প্রত্যয় শব্দের ব্যবহার বৌদ্ধশাস্ত্র ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। তবে রোগের কারণ বোঝাতে হেতু, নিমিত্ত, আয়তন, কর্ত্তৃ, কারণ, প্রত্যয়, সমুত্থান নিদান প্রভৃতি এতগুলো শব্দের ব্যবহার। এটাই নির্দেশ করে যে চরকের রচনার অনেক আগে থেকেই এ সম্পর্কে বিস্তৃত লেখালেখি হয়েছিল এবং সেগুলি আজও বিভিন্ন ধারায় আয়ুর্বেদ চর্চার ফসল বলা যায়। ন্যায়ভাষ্যের আরেক পরিচিত গ্রন্থ জয়ন্তভট্ট রচিত ন্যায়মঞ্জরী। খৃষ্টীয় ২য় শতকের বিশিষ্ট নৈয়ায়িক অক্ষপাদের রচনায় ব্যবহৃত উপাদানের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে

দশম শতকের ইতিহাসবিদ্ জয়ন্তভট্ট, বলেছেন যে অক্ষপাদ সম্ভবতঃ তাঁর গ্রন্থের বিষয় বস্তু সংগ্রহ করেছিলেন অন্য কোনো শাস্ত্র থেকে (শাস্ত্রান্তরাভ্যাসাৎ)। কিন্তু উক্তশাস্ত্র আয়ুর্বেদ শাস্ত্র কিনা সেটা পরিষ্কার করে বলেননি। তবে মজার বিষয় হল ন্যায়সূত্রে অক্ষপাদ আয়ুর্বেদকে বেদের অংশ বলে স্বীকার করেছেন। অতএব বেদ সত্য হলে আয়ুর্বেদও সত্য। তবে তা যাই হোক অক্ষপাদ চরকের আয়ুর্বেদ থেকে রসদ সংগ্রহ করলেও অনেক জায়গাতেই তিনি চরকের মূল বিষয় থেকে সরে এসেছেন এবং সেখানে তিনি তাঁর নিজস্বতা বজায় রেখেছেন। এ বিষয়ে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বিস্তৃত আলোচনা রয়েছে।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে আজও আয়ুর্বেদ শাস্ত্রের যে অমূল্য পুঁথি সম্ভার বর্তমান তার মধ্য থেকে কতকগুলি পুঁথির নাম উল্লেখ করতে পারি। যেমন- (১) অগাদরাজরত্ন। রচয়িতা ছিলেন সনামকরণ। পিতার নাম ছিল পুরারি করণ। পুঁথিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে Therapuetics বা রোগ নিরাময় পদ্ধতি এবং তার আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি। একজন প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত তার Catalogus Catalogorum গ্রন্থে এই গ্রন্থটির উল্লেখ করেছেন। (২) রাবণের অর্কপ্রকাশ। এই রাবণ ছিলেন লঙ্কাধিপতি রাক্ষসরাজ। এই পুঁথিটির বিষয়বস্তু হচ্ছে স্ত্রীলোকের গর্ভকালীন অবস্থার নানান চিকিৎসা এবং তার প্রতিকার। একজন স্ত্রীলোকের গর্ভকালীন অবস্থায় তার শারীরিক যে নানান উপসর্গ দেখা দেয় তার উপশম করার ব্যাপারে নানান আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা-পদ্ধতির উল্লেখ পুঁথিটিকে এক অন্য মাত্রা দান করে। অর্কপ্রকাশ নামে আরেকটি পুঁথি অবশ্য মানুষের জ্বরের উপশমের ব্যাপারে নানান চিকিৎসায় সাহায্য করে। কালজ্ঞানম্ নামক আরেকটি পুঁথিও মানুষের জ্বরের চিকিৎসার কথা বলে। (৩) অষ্টাঙ্গ হৃদয় সংহিতা পুঁথিটি আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির এক দিগদর্শক পুঁথি বলা যায়। এই পুঁথিটির রচয়িতা হচ্ছেন বাগভট। পিতা ছিলেন সিংহ গুপ্ত। এই পুঁথিটির অনন্যতা হচ্ছে কায় চিকিৎসা, হৃদয় চিকিৎসা, অতিসার চিকিৎসা, উদর চিকিৎসা, পাণ্ডুরোগ চিকিৎসা, কুষ্ঠ চিকিৎসা সহ আরও নানান ব্যাধির আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতির উল্লেখ। আজও এই পুঁথিটি অত্যন্ত মূল্যবান কারণ একই সঙ্গে এতগুলি ব্যাধির উপশম ব্যবস্থা আর কোনো আয়ুর্বেদিক পুঁথিতে দেখা যায় না। পুঁথিটি বাংলাভাষায় অনূদিত হয়েছে। (৪) আয়ুর্বেদমহোদধি পুঁথিটি আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অত্যন্ত মূল্যবান একটি পুঁথি। পুঁথিটির রচয়িতা সুসেন। পুঁথিটির আলোচ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে dietics বা পথ্য বিজ্ঞান এবং খাদ্যের গুণাগুণ প্রভৃতি। খাদ্য নিয়ে মানুষের মনে যখন আজ নানান প্রশ্ন তার সমস্যার অনেকখানি নিরসন করে উক্ত পুঁথিটি। ভেষজ উপায়ে তার উপশমের হদিশও দান করে উক্ত পুঁথিটি। যাইহোক আয়ুর্বেদ চিকিৎসাশাস্ত্রে এই পুঁথিটির মূল্য অপরিসীম। (৫) কংকালিরস পুঁথিটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ঔষধের নানান ব্যবহার

এবং তার নানান নামের উল্লেখ করে। পুঁথিটি অত্যন্ত মূল্যবান একটি সংকলন বলা যায়। আজও আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থায় যখন একটি ওষুধের নানান নামে সন্দেহ দেখা দেয় মানুষের মনে, তখন কিভাবে তা চেনা যায় এবং কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে তার ব্যবহার হয় তার হদিশ দেবার ক্ষেত্রে পুঁথিটি আজও অপরিহার্য। (৬) চিকিৎসারত্নসংগ্রহ পুঁথিটি আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে একটি অত্যন্ত মূল্যবান সংগ্রহ। পুঁথিটির রচয়িতা শ্রীজয়রাম। পুঁথিটির বিষয়বস্তু রোগের কারণ, ওষুধের ব্যবহার এবং ওষুধ তৈরির নানান পদ্ধতি উল্লেখ করে। অবশ্যই এটা আজ জানা প্রয়োজন রোগ সৃষ্টি কেন হয়, আর কিভাবে তার উপশম ঘটে। মানুষের কাছে তাই পুঁথিটির মূল্য আজ অপরিসীম বলা যায়। যাইহোক এরকম আরও অনেক আয়ুর্বেদিক পুঁথির কথা উল্লেখ করা যায় যারা আজও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে এক অপরিসীম মূল্য বহন করে।

বঙ্গানুবাদ প্রসঙ্গ

আয়ুর্বেদশাস্ত্রের বিপুল কর্মকাণ্ডের মধ্যে আরেক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উক্ত শাস্ত্র অন্তর্ভুক্ত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থরাজির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ। এ বিষয়ে নিঃসন্দেহে অন্যতম অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ। এছাড়াও সুযোগ্য অনেক বিদগ্ধ পণ্ডিতবর্গও এ কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। সেখানে ভাষার সঙ্গে মেলানো হল জনজীবনের মানস জগৎকে। সেখানে ভাষা এই ভাবপ্রকাশের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ রইল না, কার্যকারিতার দায় ছাড়িয়ে ভাষা পৌঁছোলো ক্রমে ক্রমে আত্মপরিচয়ের মর্মস্থলে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় – "বস্তুত প্রত্যেক ভাষার নিজের একটা ছাঁচ আছে। উপকরণ যেখান হইতেই সে সংগ্রহ করুক, নিজের ছাঁচে ঢালিয়া সে তাহাকে আপনার সুবিধামত বানাইয়া লয়। সেই ছাঁচটাই তাহার প্রকৃতিগত, সেই ছাঁচেই তাহার পরিচয়"। আসল কথা এই ছাঁচের মধ্যেই এক ধরনের ইতিহাস চেতনা গড়ে ওঠে। সেই চেতনা হারানো অতীতকে পুনরুদ্ধার করে, কালক্রমের বিকাশ ঘটায়, আর অতীতের প্রেক্ষায় বর্তমানকে নিয়ে আসে। যেভাবে প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র আজ বর্তমানের প্রেক্ষিতেও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল। যেমন 'অষ্টাঙ্গ সংগ্রহ' গ্রন্থটি মূলত সংস্কৃত ভাষায়। পুঁথিটির বঙ্গানুবাদ করেছেন শ্রীনিকেতন চক্রবর্তী, সাল ১৯৯৭। পুঁথিটির মধ্যে আছে কায় চিকিৎসা, হৃদয় চিকিৎসা, উদর চিকিৎসা সহ আটটি অঙ্গ-এর চিকিৎসা পদ্ধতির বর্ণনা। পুঁথিটি বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

ঠিক তেমনি রসার্ণব মূল গ্রন্থটি সংস্কৃত ভাষায় লেখা। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং হরিশচন্দ্র কবিরত্ন ১৯১০ সালে। সম্পাদিত রূপটি বেরোয় এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। 'চরক সংহিতা' গ্রন্থটির সম্পাদনা

হয় ১৩৯০ সালে। সম্পাদনা করেন ব্রজেন্দ্রনাথ নাগ মহাশয়। গ্রন্থটির ভূমিকা লেখেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর। অপর আরেকটি 'চরক সংহিতা' গ্রন্থের সম্পাদনা করেন ভুবনচন্দ্র বসাক ১২৯৯ সালে। গ্রন্থটি আজও অমূল্য তার বিষয়গুণে। শ্রীমতি ডালিয়া বান্দুরি ২০০৬ সালে 'চরক সংহিতার দার্শনিক ভাবনা সমীক্ষা' গ্রন্থটি রচনা করে আমাদের আরো সমৃদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশ পায় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ঠাকুর সংকলিত 'চিকিৎসা বিধানে তন্ত্রশাস্ত্র' গ্রন্থটি আজও মূল্যবান। 'জ্বর চিকিৎসা' গ্রন্থটির অনুবাদকের নাম পাওয়া যায়নি। গ্রন্থটি জ্বর এবং সর্পদংশন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে রচিত। গ্রন্থটি সুদর্শন সংহিতার অন্তর্ভুক্ত। অপর আরেকটি গ্রন্থ 'তুলসী মাহাত্ম্য'। দ্বিজ ভগীরথের রচনা। রচনাকাল ১১৬৫ বঙ্গাব্দ বা ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দ। পুঁথিটির মধ্যে তুলসীর স্পর্শ এবং তার দ্রব্যগুণ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। লেখক শ্রী খেন্তকারিকা, স্থান মানকর। আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত আরেকটি গ্রন্থ 'বস্তুতত্ত্বসার', রচনাকার লোচন দাস। সময়কাল ১২৪৫ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দ। পুঁথিটির লেখক শ্রীরাসবিহারী বসু। স্থান – পুরুলিয়া। পুঁথিটির মধ্যে চক্রপাণির নাম উল্লিখিত। আরেকটি গ্রন্থ 'অশ্ববৈদ্যক'। শরৎচন্দ্র গুপ্ত সংকলিত। সময়কাল ১৩২৫ বঙ্গাব্দ। স্থান হেতমপুর। এ ধরনের গ্রন্থ আজও আয়ুর্বেদশাস্ত্রে অসীম মূল্য বহন করে। সর্বোপরি সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত রচিত 'আয়ুর্বেদ' গ্রন্থ এবং মধুসূদন কবিরাজ এবং ইন্দ্রজিৎ সেন কবিরাজ রচিত 'আয়ুর্বেদ সংগ্রহ' গ্রন্থটির কথা নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। 'আয়ুর্বেদ সংগ্রহ' গ্রন্থটির রচনাকাল ১৩০৯ বঙ্গাব্দ বা ১৯০২ শকাব্দ। গ্রন্থটি সংশোধিত হয়েছিল দেবেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং উপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক। যাইহোক এছাড়াও আরও অসংখ্য আয়ুর্বেদ গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় আজ অনূদিত এবং সেগুলি আজও আমাদের আয়ুর্বেদ শাস্ত্র এবং চিকিৎসা পদ্ধতির প্রাণস্বরূপ বলা যায়। ❑